ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607019

বঙ্গীয় বদ্বীপে কৃষিজীবীর ‘আলস্য’ ও ‘কর্মবিমুখতা’: একটি পর্যালোচনা

আনন্দ অন্তঃলীন*

Abstract: Historians, colonial administrators and foreign travelers all have talked about and described the ‘idleness’ and ‘indolence’ of the peasants of the Bengal delta. Such commentary and analysis stems from western ideas about labor. But the historical ecological situation of the delta, correlated with a particular political economy and cultural patterns of the region presents us with a different account. The geopolitically detached delta and its subsistence economy had created a work ethic that is vastly different from the ideals of western society’s profit-driven market economy. Thus, the narratives of supposed indolence of the peasants of the Bengal delta are not descriptions of reality, rather they are narratives rooted in a contrasting socio-political, economic, cultural, ethical understanding.

মুখ্যশব্দ: বঙ্গীয় বদ্বীপ, কৃষিজীবী, কর্ম-মূল্যবোধ, রাজনৈতিক অর্থনীতি, শ্রম

ভূমিকা

‘আলস্য’ ও ‘কর্মবিমুখতা’ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বুঝতে হলে শুরুতেই বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষির বিবর্তন ও বিকাশের সাথে বোঝাপড়া তৈরি করা প্রয়োজন। এই বৈবর্তনিক গতিপথ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে প্রাচীনকালের জীবিকা অর্থনীতির (subsistence economy) সাথে সম্পর্কিত কৃষিব্যবস্থা এক ধরনের কর্ম-মূল্যবোধ (work ethic) তৈরি করেছিল এবং পরবর্তীকালের রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া (state making process) ও উপনিবেশবাদ প্রথাগত সেই আর্থসামাজিক ও মূল্যবোধের কাঠামোকে ধ্বংস করে নতুন কিছু ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সামাজিক ইতিহাসের যে ধরনের একরৈখিক আখ্যান তৈরি করে, সেখানে দেখানো হয় সকল মানবসমাজই শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে পশুপালক, কৃষিজীবী সমাজের ধাপ পার করে শিল্পায়িত সমাজের দিকে এগোবে। এ ধরনের ইউরোকেন্দ্রিক (Eurocentric) চিন্তায় সামাজিক বিবর্তনকে প্রগতির মাপকাঠির সাথে অযৌক্তিকভাবে একত্র করে ফেলা হয় এবং কোনো সমাজ ‘উন্নতির’ কোন ধাপে আছে তার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাঠামোকে। অবশেষে,

* প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঔপনিবেশিক আমলে যখন বাংলা অঞ্চল বা বাঙালির ইতিহাসগুলো লেখা হতে থাকে, ততদিনে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই ইউরোকেন্দ্রিক ধারণাসমূহই স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে জেঁকে বসেছে এবং এই অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের শ্রম-বিষয়ক আলোচনায় তারই একটা ছাপ পড়েছে।

বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবেই তার কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্য পরিচিত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত কৃষিজীবী মানুষের শ্রম। যদিও এই অঞ্চলের কৃষিজীবীদের শ্রমকে বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে, তবে এই বৃহৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মঘণ্টার বিষয়টি বরাবরই রয়ে গেছে উপেক্ষিত। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও প্রকট। এই লেখায় মূলত পূর্ববঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মঘণ্টার প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। শ্রম ও শ্রমের ইতিহাসের অ্যাকাডেমিক অধ্যয়ন খুব কমই কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কর্মঘণ্টার ওপর আলোকপাত করেছে এবং সেই কারণে এই বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পরিমাণও যথেষ্ট কম। এই বিষয়ে আমরা যে-সকল তথ্য পেয়ে থাকি তার অধিকাংশই সংগ্রহ করতে হয় ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের নানাবিধ রিপোর্ট, ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ, কিংবা এদেশীয় ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে। এসকল ব্যাখ্যা, বিবরণ, রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাই, তা হলো 'পূর্ববঙ্গের' কৃষক বা কৃষি শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা ছিল বেশ কম। যার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসক থেকে বাঙালি ইতিহাসবিদ পর্যন্ত প্রায় সকলকেই এই অঞ্চলের মানুষকে অলস, আয়েশি, কর্মবিমুখ প্রভৃতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই লেখায় আমার মূল বক্তব্য হলো, বঙ্গীয় বদ্বীপের অস্থিতিশীল, পরিবর্তনশীল ও দুর্গম প্রতিবেশগত (ecological) অবস্থার সাথে জীবিকা অর্থনীতিকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্ম-মূল্যবোধের সংযোগ ঘটার কারণে এখানকার কৃষিজীবীর কর্মঘণ্টা তুলনামূলকভাবে সীমিত থেকেছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত প্রধানত দ্বৈতীয়িক (secondary) উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধারে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবেদন, চিঠিপত্র ও নথি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইতিহাসবিদের বিবরণও তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক বিবর্তনের তথ্য ও তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে অন্য উৎস থেকে, যেহেতু বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই ভূগোল ও প্রতিবেশগত পর্যালোচনা অনুপস্থিত রয়ে গেছে। প্রবন্ধটির সামগ্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির কেন্দ্রে রয়েছে একটি অরাজপন্থি নৃবৈজ্ঞানিক (Anarchist anthropological) দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে পশ্চিমা বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পুঁজিবাদের মুনাফা-কেন্দ্রিক উৎপাদন ও শ্রমব্যবস্থার পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে শ্রম, আলস্য, নজরদারি ও রাষ্ট্রযন্ত্র সংক্রান্ত অরাজপন্থি তথা অ্যানার্কিস্ট চিন্তা ও দর্শন।

বঙ্গীয় বদ্বীপে কৃষিব্যবস্থার বিবর্তন: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উনিশ শতকে লুইস হেনরি মর্গান, ই. বি, টায়লর, হেনরি সাম্নার মেইন প্রমুখ সামাজিক তাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের বিবর্তনবাদী তত্ত্বে ও চিন্তায় সমাজকাঠামো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক প্রকারের সরলীকরণ ও ইতিহাস বিবেচনায় এক ধরনের একরৈখিকতা লক্ষ করা যায়। তা সত্ত্বেও এই ধরনের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে অনেক প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষির ইতিহাস পর্যালোচনা করা হলেও এক ধরনের বিবর্তনই আমাদের চোখে ধরা পড়বে এবং কৃষির রূপান্তর ও পরিবর্তনকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিক প্রবণতাই বেশি পরিলক্ষিত হবে। পশ্চিমা বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রবণতা হচ্ছে, সমাজ-অর্থনীতির রূপান্তরকে 'প্রগতি' ও 'উন্নতি'র সাথে মিলিয়ে ফেলা; সেখানে সাধারণত মনে করা হয়, একটা সমাজে প্রযুক্তিগত সূক্ষ্মতা যতো বৃদ্ধি পায়, সে সমাজ তত উন্নত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ একটি সরল, একরৈখিক প্রক্রিয়ায় মানব সমাজ শিকার-সংগ্রহ থেকে পশুপালন, উদ্যানচাষের (horticulture) ধাপ পার করে কৃষিকাজের ধাপে পৌঁছায়। কিন্তু বঙ্গীয় বদ্বীপের রূপান্তর বা বিবর্তনের সাথে 'প্রগতি' বা 'উন্নতি'র যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তা একেবারেই সরল কোনো প্রক্রিয়াও ছিল না। রিচার্ড ইটন (১৯৯৩) মনে করেন, বাংলা অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা (যাদের তিনি প্রাক-মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) স্থানান্তর কৃষির (shifting cultivation) চর্চা করত এবং স্থায়ী কৃষিজমিকেন্দ্রিক চাষাবাদের উদ্ভব ঘটে আরও পরে (পৃ. ৫)। ইটন আরও দেখান, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বদ্বীপের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে স্থানান্তর কৃষির পরিবর্তে ধীরে ধীরে স্থায়ী কৃষির প্রবর্তন শুরু হয়, যা ক্রমান্বয়ে বঙ্গীয় বদ্বীপকেও প্রভাবিত করে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের শাসনামলে রচিত কিছু ব্রাহ্মী লিপি বা লেখমালা থেকে এটাও জানা যায় যে, সে সময় নাগাদ বরেন্দ্র অঞ্চলে সরল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন স্থানান্তর কৃষির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত জটিল পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল স্থায়ী চাষাবাদের সূচনা হয়ে গিয়েছে (Eaton, 1993, p. 9)। নতুন কৃষিজমি তৈরির প্রক্রিয়া ছিল সম্রাট অশোকের জন্য রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া তথা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির কৌশলের অংশ। কৃষিজমি তৈরির মাধ্যমে খাদ্যশস্য বা কর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে অন্য যেকোনো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মতো অশোক মূলত তার রাজকোষের সমৃদ্ধি ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং কর সংগ্রহের জন্য স্থানান্তর কৃষির চেয়ে স্থায়ী কৃষি অনেক বেশি কার্যকর। এই কারণে অশোকের শাসনামলে নতুন কৃষিপ্রধান, জনবসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চল তৈরির ওপর জোরারোপ করা হয়েছে এবং সেই জায়গাগুলোতে শূদ্র বর্ণের মানুষদের কৃষিকাজে নিযুক্ত করার (শূদ্রকর্ষপ্রায়ঃ) আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সাথে অশোক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নজরদারি বজায় রাখার জন্য 'সীতাধ্যক্ষ' নামক রাজকর্মচারী নিয়োগের কথাও বলেছিলেন। তবে

অশোকের এই নীতি তার সাম্রাজ্যের প্রান্তে থাকা বঙ্গীয় বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে কতটুকু প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না (রণবীর, ২০১৯, পৃপৃ. ১০৬–১০৭)।

আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাংলা অঞ্চলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা কাজ করলেও পশ্চিম ভারতের স্থায়ী কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ যাজক বাংলা অঞ্চলে আসে। এই আগমন মৌর্য শাসনামলে শুরু হলেও গতিশীলতা পায় পঞ্চম শতাব্দীতে। বদ্বীপের আদি অধিবাসীরা নিড়ানির মতো অপেক্ষাকৃত সরল যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষিকাজে অভ্যস্ত থাকলেও স্থায়ী ক্ষেতে ধান চাষের জটিলতা সম্পর্কে তেমন একটা জ্ঞান রাখত না। এর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, একই সাথে কৃষির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক শ্রম সংগঠনেরও পরিবর্তন ঘটে এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস সংবলিত একটি সমাজ তৈরি হয় (Eaton, 1993, p. 10)। তবে পুরো বদ্বীপ অঞ্চলে যে আর্যাবর্তের প্রভাব সমভাবে পড়েছিল তা নয়। বদ্বীপের পশ্চিমাংশের সাথে আর্যাবর্ত তথা গাঙ্গেয় সমভূমির এক প্রকারের ভৌগোলিক ধারাবাহিকতা ছিল এবং বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় ও পরিপক্ব বদ্বীপেই অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এসে বসবাস ও পশ্চিমা ধাঁচের কৃষিকাজ শুরু করে। সেন যুগে ভাগীরথী-হুগলি অঞ্চলে স্থায়ী হওয়া ব্রাহ্মণদের কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (Eaton, 1993, p. 18)। বদ্বীপের পূর্বাংশের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এর পেছনে রয়েছে জলবায়ু ও প্রতিবেশগত কারণ। একই সাথে, যেহেতু পূর্ব-বদ্বীপ আর্যাবর্ত বা গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে ভৌগোলিকভাবেই খানিকটা বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই এই অঞ্চলের কৃষিতে ইন্দো-আর্য প্রভাব 'বিশুদ্ধভাবে' বিস্তৃত হতে পারেনি, অনার্য সংস্কৃতিসমূহের সাথে এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া এখানে ঘটেছে।

আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীতে গতিলাভ করা এই স্থায়ী কৃষিব্যবস্থা মগধ ও পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশে বিস্তার লাভ করলেও পূর্ব-বদ্বীপে তা নানা কারণে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। করতোয়া নদীর পূর্বদিক ও পদ্মা নদীর দক্ষিণ দিক আগের মতোই জলাভূমি ও বনাঞ্চলে ছেয়ে ছিল এবং সেখানে বসবাস করত অনার্য মানুষেরা, যাদের কৃষিব্যবস্থা তখনো স্থানান্তরমূলক এবং যাদের কৃষি ও কৃষিশ্রম সংক্রান্ত কাঠামো, মূল্যবোধ আর্যাবর্তের সংস্কৃতি থেকে অনেক আলাদা। তেরো শতকের শুরুতে মুসলিমরা যখন বাংলায় আসে তখনো অবস্থা প্রায় একইরকম ছিল (Eaton, 1993, p. 21)। সময়ের সাথে সাথে বদ্বীপের উর্বর অঞ্চল ক্রমশ পূর্বদিকে সরে যেতে থাকলে এবং এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে সেখানে কৃষি সংস্কৃতির পরিবর্তনে নতুন ধারার সূচনা হয়।

সুলতানি আমল ও মোঘল আমলে প্রতিবেশগত পরিবর্তন, প্রশাসনিক পরিবর্তন ও সার্বিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষির বহুরৈখিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলোতে আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে ইংরেজদের

পুঁজিবাদী মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আবির্ভাবের ফলে প্রথাগত সকল কাঠামো ভেঙে যাওয়া শুরু করে এবং কৃষকের শ্রম বাজারব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে পুরোপুরি নতুন দিকে মোড় নেয়। জীবিকা-অর্থনীতি ও জীবিকা-মূল্যবোধ (subsistence ethic) নস্যাৎ করে ফেলা হয় এবং প্রথাগত আর্থসামাজিক নকশা ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে শুরু হয় পুঁজিবাদী কর্ম মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।

কর্মঘণ্টা ও আলস্যের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'কর্মঘণ্টার' পর্যালোচনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিষয়টি স্বয়ং সময়ের ধারণা। সময়ের যান্ত্রিক ও সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের বিষয়টি এক অর্থে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা যার শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় শিল্প-পুঁজিবাদের সূচনায়, যখন থেকে পুঁজিপতি শ্রেণি সময়কে একটি উৎপাদন খরচ ও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচনা শুরু করে। কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কর্মদিবস বা কর্মঘণ্টার হিসাব হতো বীজ বপন ও ফসল তোলার ভিত্তিতে এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে তা-ই হয়ে থাকে (Woodcock, 2016)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সকল কৃষিজীবী শ্রমিকের কর্মঘণ্টা বিষয়ক একটি একরৈখিক বিবরণ তৈরি করা সহজ মনে হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে কৃষিজীবী মানুষের বাস্তবতা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে ও তা বিবর্তিত হয়েছে নানা প্রক্রিয়ায়। অপর যে বিষয়টি কর্মঘণ্টা ও আলস্যের আলোচনার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, তা হলো 'সুন্দর জীবনের' (Good life) ধারণা। রবার্ট রেডফিল্ড (Redfield, 1956, pp. 120−121) মনে করেন, কৃষকের সুন্দর জীবনের 'সুন্দর' ব্যাপারটার অনেকগুলো মাত্রা থাকতে পারে এবং তা সবসময়ই নির্ভর করে প্রেক্ষাপটের ওপর। একটি নির্দিষ্ট সমাজে কৃষক কি কঠোর পরিশ্রমকে ভালো মনে করে? নাকি সে ক্ষেতে কাজ করার চেয়ে অবসর বা কর্মমুক্তিকে বেশি ভালো মনে করে? এই বিষয়গুলোর সাথে বোঝাপড়া তৈরি করা কর্মঘণ্টার বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে, 'আলস্য' ও 'কর্মবিমুখতা'র সাথে জড়িত বিষয়টি হলো কর্ম মূল্যবোধ বা work ethic. ম্যাডসেন (Madsen, 2018) মনে করেন, একজন ব্যক্তিকে কেন অলস বলা হবে, তার পর্যালোচনা করা অনেক জটিল কাজ এবং অন্য কাউকে 'অলস' বলে আখ্যায়িত করা হলে তা 'অলস ব্যক্তি' সম্পর্কে যতটা না জানায়, তার চেয়ে বেশি বেশি আমরা জানতে পারি আখ্যাদানকারী ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে। কর্ম মূল্যবোধ সম্পর্কিত সবচেয়ে পরিচিত কাজ সম্ভবত ম্যাক্স ওয়েবারের ১৯০৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. বইটিতে ওয়েবার (Weber, 2010) দেখানোর চেষ্টা করেছেন কীভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট (বিশেষত ক্যালভিনীয়) ধর্মীয় মূল্যবোধ একটি নির্দিষ্ট কর্ম মূল্যবোধ সমাজে প্রচারের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশ নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এই অর্থনৈতিক কাঠামো ও কর্ম মূল্যবোধ নিয়ে ইউরোপের বাইরে যাওয়া শুরু করে এবং তাদের নিজস্ব বোঝাপড়া দিয়ে স্থানীয় মানুষদের জীবনধারা ও মূল্যবোধ যাচাইয়ে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ক্লাসত্রেস

(Clastres, 1989) দেখিয়েছেন কীভাবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের মুনাফাকেন্দ্রিক কর্মমূল্যবোধ, জীবিকা অর্থনীতির কর্মমূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত মুনাফা বৃদ্ধি করতে না চাওয়া মানুষকে ইউরোপীয়রা কীভাবে 'অলস' ও 'কর্মবিমুখ' বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩–১৯৮১), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭–১৯০৯), অতুল সুর (১৯০৪–১৯৯৯), অজয় রায় (১৯২৮–২০১৬)সহ প্রায় সকল ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিকই বদ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোকেই এই ভূখণ্ডের সমাজকাঠামো হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। অতএব খানিকটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, এই মানুষগুলোর শ্রম ও শ্রম সংক্রান্ত আলোচনা মূলত কৃষির প্রেক্ষাপটেই হয়েছে। তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বও অস্বাভাবিক নয়। এখানকার সংস্কৃতিতে কৃষির প্রাধান্য থাকলেও এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে পুরো অর্থনৈতিক জীবন ও সার্বিক জীবিকা কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। মধ্যযুগের সাহিত্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলার মানুষের শিকারে যাওয়ার ঘটনাও উঠে আসে (Shamsuzzoha, 2022, p. 86)। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে বাঙলা অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী আদি-অস্ট্রালয়েডদের অভিহিত করেন, "অতি সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক" হিসেবে; এবং পরবর্তীকালের সাঁওতাল ও মুণ্ডা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "ইহারা কিছুটা কল্পণাপ্রবণ, দায়িত্বহীন, অলস, ভাবুক এবং কতকটা কামপরায়ণও বটে" (বা. ১৪২২, পৃ. ১০৪)। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৭) আঠারো শতকের বাঙালি কৃষকদের ব্যাপারে সমকালীন পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে দেখান যে, সে-সময়ের অনেকেই এই কৃষকদের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তাদের "অলস, উদাসীন ও বেহিসাবি" বলে অভিহিত করা হয়েছে (পৃ. ৭৭)। আরও বলা হয়, সে সময়ে কৃষকের বছরে ছয় মাসের বেশি কাজ থাকত না, বাকি সময় তারা "শুধু গল্প গুজব করে, মাছ ধরে, দাওয়ায় বসে হুকা টেনে সময় কাটিয়ে দেয়" (পৃ. ৭৮)। ঔপনিবেশিক যুগে অর্থকরী ফসল চাষ শুরু হওয়ার পরেই বরং বছরব্যাপী কাজ করার প্রবণতা দেখা দেয় (পৃ. ৭৮)।

মুনতাসীর মামুন ও মাহবুবুর রহমান তাঁদের সম্পাদিত *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গরীবদের জীবন* (২০১২) গ্রন্থে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের *A Statistical Account of Bengal*-এর বিবরণ বিশ্লেষণ করেন। সেখানে আলস্য, কর্মবিমুখতা ও কর্মঘণ্টা বিষয়ক কিছু তথ্য-উপাত্ত উঠে আসে। এসকল তথ্য-উপাত্ত থেকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের চিত্র আমরা দেখতে পাই। হান্টারের বইয়ের প্রথম খণ্ডে সুন্দরবন অঞ্চলের চাষিদের বিবরণ পাওয়া যায় – "...জমি যেখানে প্রচুর, সেখানে চাষিদের মধ্যে কিছু দারিদ্র্য যে দেখা যায়, তার কারণ তাদের বোকামি ও আলসেমি, দুর্ভাগ্য কিংবা শোষণ সে জন্য দায়ী নয়" (পৃ. ৭৮)। ষষ্ঠ খণ্ডে পাওয়া

যায় কুমিল্লার ক্ষেতমজুর ও দিনমজুরদের কথা। সেখানে বলা হয়, "ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর হয়ে জন খাটতে কেউ রাজি হয় না। যখন তাদের কোন কাজ থাকে না তখনও চড়া মজুরি দিলে তারা কাজে যায় না। তাদের প্রয়োজনও খুব বেশি নয়, তাদের যা দরকার তা তারা জমি থেকেই পেয়ে যায়। তাই আলস্যে সময় কাটাতে পারে" (পৃ. ৮৭)। রংপুরের চাষিদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে তারা বেলা একটার পর আর মাঠের কাজ করে না, চাষিরা দৈনিক দুই ঘণ্টার বেশি কাজ করে না (পৃ. ৯০)। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত (২০০৮, পৃ. ১১৭) বলছেন, আশ্বিন-কার্তিক মাস কৃষকেরা এক অর্থে "বসে বসে কাটায়, অন্তত ধান কাটার ব্যাপারে"।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার, এসকল ইতিহাসবিদ (ইউরোপীয় কিংবা উপমহাদেশীয়) প্রায় পুরোপুরি ইউরোপীয় চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং শ্রম ও আলস্য বিষয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা ছিল একেবারেই ইউরোকেন্দ্রিক, যেখানে পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া কর্ম-মূল্যবোধেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এসকল লেখকদের শ্রম বা কাজ সংক্রান্ত ধারণা ছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে প্রোথিত। তাই তাঁদের ভাবাদার্শগত দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন– পুঁজিবাদী, জাতীয়তাবাদী বা সমাজতন্ত্রী– শ্রমের 'মাহাত্ম্যের' ধারণার ওপর সকলেরই এমন একটা ভরসা ছিল যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই প্রগাঢ়। এর ফলে অবসর সময়ের 'প্রাচুর্য' নিয়ে যেমন এক প্রকারের নেতিবাচক চিন্তা কাজ করেছে, তেমনি 'অলস' বা 'শ্রমবিমুখ' সমাজ বা ব্যক্তিকে নানাভাবে হেয় করার চেষ্টাও বিদ্যমান ছিল। তাঁরা শ্রম বা অবসর সম্পর্কিত নিজস্ব (পশ্চিমা-সংস্কৃতি ঘেঁষা) ধারণা সকল প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এর ফলে শ্রমের স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানের অনেক সহজাত বিষয়ও তাদের চোখে বিকৃতভাবে বা বিকৃত হয়ে ধরা পড়তে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে।

এখানে এটাও দ্রষ্টব্য যে, কৃষিকে যতোটা মর্যাদা দিয়ে সবসময় বিবেচনা করা হয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে বারবার যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত চাষিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই মর্যাদা বা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শ্রেণিবিভাজিত আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাকে যেমন প্রতিনিয়ত প্রান্তিক হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে, সামাজিকভাবেও তার অবস্থান হয়েছে কাঠামোগত সহিংসতার শিকার। কৃষিজীবী মানুষ তথা চাষিদের নিয়ে প্রচলিত নানা প্রবাদ, প্রবচনেই তা উঠে আসে। এসকল প্রবাদে কৃষককে তুলে ধরা হয় "হীন, চরম নির্বোধ, অকর্মণ্য এবং মূর্খ" মানুষ হিসেবে (বরুণকুমার, ২০১৫, পৃ. ১৪৯); নয়তো এ ধরনের মানুষের (প্রতীকী) প্রতিনিধি হিসেবে; বা হয়তো নিতান্তই মনে করা হয় কৃষকের মধ্য দিয়েই আলস্য বা অকর্মণ্যতাকে যথাযথভাবে চিত্রিত করা সম্ভব। 'কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে" কিংবা 'মনে মনে হাসে চাষা, কাঁধে লাঙ্গল জাত ব্যবসা'– বরুণকুমার চক্রবর্তীর বিশ্লেষণে উঠে আসা সেরকমের কিছু প্রবাদের দুটি উদাহরণ। বরুণ মনে করেছেন, কৃষককে (বা কৃষকের কর্ম-মূল্যবোধ তথা work ethic-কে) এভাবে ছোটো করার উদ্দেশ্য

তার ওপর চলতে থাকা শোষণকে চিরস্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে বারবার এ জাতীয় কথা বলার মাধ্যমে কৃষককে মনে করিয়ে দেওয়া হবে- যে, তার সাথে এমনটাই হওয়ার কথা (পৃ. ১৫৭)। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই যৌক্তিক। কিন্তু আমাদের মতে বিষয়টাকে এমনভাবেও দেখা যায় যে, হয়তো বদ্বীপে কৃষকের সীমিত কর্মঘণ্টা ও অধিক অবসর অন্যান্য জীবিকার মানুষ ও তাদের কর্ম মূল্যবোধ থেকে এতটাই আলাদা ছিল যে কৃষকদের কর্মজীবনের বাস্তবতা তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। হয়তো বাংলা অঞ্চলের কৃষির বৈশিষ্ট্যগত কারণেই কৃষক অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের মানদণ্ডে নির্বোধ, অকর্মণ্য ও মূর্খ হিসেবে ধরা দিয়েছে।

কৃষকের কর্মঘণ্টা এবং অবসর: কয়েকটি পর্যবেক্ষণ

নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিককে আমরা বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীদের 'অলস', 'উদাসীন' 'দায়িত্বহীন' ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দে অভিহিত করতে দেখি। তাঁদের এমন মন্তব্যের পেছনে রয়েছে কর্ম মূল্যবোধের (work ethic) পশ্চিমা কিছু ধারণা। তবে এই বদ্বীপের প্রতিবেশগত, আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা পুরোপুরি ভিন্ন একটি চিত্র খুঁজে পেতে পারি। এই বিষয়গুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলোর সমন্বয়েই এমন একটি সার্বিক পরিস্থিতি তৈরি হয় যা সীমিত কর্মঘণ্টা, অধিক অবসরের জন্য সহায়ক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা তথাকথিত কর্মবিমুখতাকেও যুক্তিসঙ্গত কারণে সমর্থন করে।

প্রতিবেশগত উপাদান

প্রথমেই আমাদের প্রতিবেশগত অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এর পেছনে রয়েছে দুটি কারণ। প্রথমত, কৃষিকাজের সাথে পরিবেশগত অবস্থা ও আবহাওয়ার সম্পর্ক একেবারে প্রত্যক্ষ। কৃষির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাথে মাটি, পানি, জলবায়ুর সম্পর্কের গল্প। বাংলা অঞ্চলের কৃষির সমৃদ্ধি, তথা 'অল্প শ্রমে অধিক ফসল' বরাবরই সম্ভব হয়েছে এই অঞ্চলের প্রতিবেশগত উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট উর্বর ভূমির কারণে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশগত অবস্থার কারণে এমন কিছু ভূ-রাজনৈতিক ও মূল্যবোধগত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যা এই অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের কর্ম-মূল্যবোধ নির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। পূর্ববঙ্গের প্রায় পুরোটাই বদ্বীপ অঞ্চল। হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তনশীল অসংখ্য নদীপথ ও নদীব্যবস্থার (river system) সমন্বয়ে এই অঞ্চলের বদ্বীপ গঠিত হয়েছে। বঙ্গীয় বদ্বীপকে তিনভাগে ভাগ করা হয়– ১. মৃতপ্রায় বদ্বীপ, ২. পরিপক্ব বদ্বীপ ও ৩. সক্রিয় বদ্বীপ। বাংলাদেশের যশোর ও খুলনা অঞ্চল মৃতপ্রায় ও পরিপক্ক বদ্বীপের অংশ এবং সুন্দরবন, বরিশাল, পটুয়াখালী, দক্ষিণ ফরিদপুর, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে সক্রিয় বদ্বীপ (আবদুল ও আকসাদুল, ২০১৯, পৃ. ৬)। অর্থাৎ যেখানে এই

অঞ্চলের একটা বড় অংশ এখনও গঠিত হচ্ছে, সেখানে প্রাচীনযুগে বা মধ্যযুগেও ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা অনেকটাই আলাদা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। 'বাংলা' বা 'পূর্ববঙ্গ' বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা সবসসময় একটা সমন্বিত ও একক ভূখণ্ড ছিল, এমনটা মনে করাও হবে অযৌক্তিক। বদ্বীপ গঠিত হয় ক্রমান্বয়ে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রাগৈতিহাসিক কালে এই অঞ্চলের ভূগোল কেমন ছিল তা এখন আর সুচারুভাবে জানা সম্ভব নয়। তবে ইউরোপীয় প্রশাসক, বণিক ও মানচিত্রকরেরা বাংলা অঞ্চলকে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে আমরা কিছু খণ্ডিত চিত্র খুঁজে পাই। ১৬১৯ সালের ব্যাফিন-রো মানচিত্র, ১৬৫৭ সালে অঙ্কিত নিকোলাস স্যানসনের মানচিত্র, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৬৮০ সালের থর্নটন মানচিত্র, ১৭২৬ সালের ম্যাথিউস ভ্যান ডেন ব্রুকের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা মানচিত্র– সবগুলোর মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও এটা স্পষ্ট যে, এই অঞ্চলে একটি সংগঠিত ও 'পূর্ণ' ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে শত শত বছর ধরে নদীবাহিত পলিমাটি জমা হওয়ার মধ্য দিয়ে। মানচিত্রগুলোতে বাংলা অঞ্চল উপস্থাপিত হয়েছে দ্বীপপুঞ্জের মতো করে। বাংলা হয়তো কখনও দ্বীপপুঞ্জ ছিল না, কিন্তু বৃহদাকার নদী ও সুবিস্তৃত, জটিল নদীব্যবস্থা, চরাঞ্চল ও জলাভূমি সুনিশ্চিতভাবেই বাংলাকে করে রেখেছিল একটি দুর্গম অঞ্চল; যা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাম্রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীর জন্য ছিল অনধিগম্য ও প্রশাসনের জন্য তৈরি করেছিল শাসনের অযোগ্য একটি জনগোষ্ঠী।

মানচিত্র: ১; ব্যাফিন রো মানচিত্র (১৬১৯)
সূত্র: Mapping Bengal

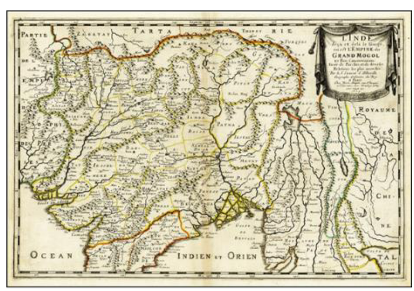

মানচিত্র: ২; স্যানসন মানচিত্র (১৬৫৭)
সূত্র: Mapping Bengal

মানচিত্র: ৩; থর্নটন মানচিত্র (১৬৮০)
সূত্র: Mapping Bengal
(https://mappingbengal.com)

মানচিত্র: ৪; ভ্যান ডেন ব্রুক মানচিত্র (১৭২৬)
সূত্র: Mapping Bengal
(https://mappingbengal.com)

মানচিত্রগুলোতে ভৌগোলিক অবস্থার এরূপ বৈচিত্র্যের একাধিক কারণ থাকতে পারে। একটা সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে জমির ভাঙাগড়া, যা এই বর্ষাপ্রবণ ও পলিমাটি গঠিত অঞ্চলের আদি বৈশিষ্ট্য। মানচিত্রগুলোর এই ধরনের 'অসঙ্গতির' আরেকটা কারণ হচ্ছে নদীর গতিপথ ও সামগ্রিক নদী ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনশীলতা এবং নদীপথ ও পলিমাটির ভাঙাগড়ার চক্রের মধ্য দিয়ে দ্বীপ গড়ে ওঠা ও বিলীন হয়ে যাওয়ার অবিরত প্রক্রিয়া; তাছাড়া সতেরো শতকে সমুদ্রতীর সংলগ্ন বদ্বীপ অঞ্চলে অনেক পরিবর্তনও ঘটেছিল (অনিল, ২০১৯, পৃপৃ. ৯–১০; অতুল, ২০০৮, পৃপৃ. ৩৩–৩৯)। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য-উপাত্তের সংমিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা মানচিত্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অবস্থা দেখা যায়। আরেকটা কারণ হতে পারে, বঙ্গীয় বদ্বীপের সূক্ষ্ম, দুরূহ ও ক্রমপরিবর্তনশীল নদীব্যবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা প্রাচীন বা মধ্যযুগের মানচিত্রাঙ্কন জ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এখানকার মানুষ কখনও ভাবার সুযোগ পায়নি যে তারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা করতে সমর্থ। একদিকে হিমালয় থেকে বয়ে আসে মাটি আর অন্যদিকে সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থান করা এই ভূমিতে প্রতিবেশগত উপাদান সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিতে বরাবরই প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে এসেছে (Van Schendel, 2009, p. 9)। কিন্তু এরূপ ভৌগোলিক অবস্থার সাথে কৃষিজীবীদের কর্মঘণ্টার সম্পর্ক কী রকম? পৃথকভাবে বঙ্গীয় বদ্বীপের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে গেলে সম্পর্কটা কীরকম হয়? "ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই ভূখণ্ডের অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা এবং জলবায়ু" অর্থাৎ সার্বিক প্রতিবেশগত অবস্থা এই অঞ্চলকে কৃষিজ উৎপাদনের জন্য অনুকূল করে তুলেছে এবং এই প্রতিবেশগত অবস্থাগুলোই প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে (রুমী, ২০২২, পৃ. ২১৩)। আবার অন্যদিকে বৃহদাকার নদী, বন্যা ডেকে আনা বর্ষাকাল, উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাস এবং ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের এই ভূখণ্ডে জমি বা

ফসলের স্থায়িত্ব সবসময় নিশ্চিতও নয়। ইতিহাসবিদ সুগত বোস মনে করেন, বাংলা অঞ্চলের বস্তুগত তথা প্রতিবেশগত পারিপার্শ্বিকতার এরূপ নশ্বরতা বা অস্থায়িত্ব এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে এক প্রকারের “আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মানসিকতা” তৈরি করেছে (Bose, 1993, p. 9)। তবে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যে পুরোপুরি একই রকম প্রতিবেশগত অবস্থা বিদ্যমান ছিল তা নয়। বাংলার, এমনকি পূর্ববঙ্গেরও একেক অঞ্চলে একেক রকমের মাটি, আবহাওয়া ও পানিসম্পদ বণ্টন বা প্রাপ্তির বিচিত্র রকমের অবস্থা দেখা যেত। এর ফলে দেখা দিয়েছিল ধানের নানা প্রজাতি যেগুলো নির্দিষ্ট প্রতিবেশে বেড়ে ওঠার জন্য ছিল উপযুক্ত (Iqbal, 2010, p. 42)। স্বভাবতই একেক প্রজাতির ধান উৎপাদনে বিনিয়োগকৃত শ্রমের সময় ও ধরনও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া ফসলের এই বৈচিত্র্য ছিল পুঁজিবাদ-পূর্ব কৃষি সমাজে খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক সমতা বিধানের একটি সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত (Scott, 1976, p. 5)।

বঙ্গীয় বদ্বীপের প্রতিবেশগত অবস্থা নিশ্চিতভাবেই কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি এমনকি এই মানুষদের শ্রমের যাবতীয় বিষয়াবলি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে এই প্রতিবেশগত অবস্থার কারণে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যা পর্যায়ক্রমে তৈরি করেছিল জীবিকা অর্থনীতির একটি কাঠামো। জীবিকা অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের কারণেই তৈরি হয় কর্ম-মূল্যবোধের কিছু উপাদান যা সরাসরি কর্মঘণ্টার প্রকৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে। এই প্রসঙ্গে আমরা একটু পরেই ফিরে আসবো।

ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক উপাদান

একটা জনগোষ্ঠীর কর্মঘণ্টা কীরকম হবে তা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর। কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। বিবর্তনবাদী তত্ত্বের একরৈখিক চিন্তা ধরে নেয় শিকারি-সংগ্রাহক কিংবা পশুপালক সমাজ ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়ে স্থায়ী (sedentary) জীবনযাপন ও কৃষিকাজ শুরু করার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য সবসময়ই হয়ে থাকে এর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষকে যতটা সম্ভব উৎপাদনক্ষম করে তোলা, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশাসনিক নজরদারির অধীনে নিয়ে আসা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ওপর যতটা সম্ভব কর আরোপ করা (Scott, 2009, p. 5)। এর ফলে অধিকৃত জনগোষ্ঠীগুলোর প্রথাগত জীবিকা-অর্থনীতির আর্থসামাজিক কাঠামো ধীরে ধীরে বা জোরপূর্বক ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং একেক প্রেক্ষাপটে এর ফলাফল হয় একেক রকমের। যেসকল কৃষিভিত্তিক জনগোষ্ঠী জীবিকা-অর্থনীতি তথা subsistence economy-র সাথে যুক্ত থাকে এবং কোনো প্রকারের বাণিজ্য বা মুনাফার কথা না ভেবে চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিজ উৎপাদন পরিচালনা করে, তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া তখন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের চাহিদার (এবং লোভ) সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। জেমস স্কট (২০০৯) আরও দেখান যে, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য চালানোর

প্রাথমিক প্রক্রিয়া হচ্ছে শিকার-সংগ্রহ, যাযাবরবৃত্তি, মাছ ধরা বা স্থানান্তর কৃষির (shifting cultivation) মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রহিত করে কৃষিজমি তৈরি করা ও মানুষকে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাসে বাধ্য করা। এসকল প্রক্রিয়া একদিকে যেমন রাষ্ট্র অভিগম্য পণ্য (state accessible product) উৎপাদন নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর সংগ্রহ সহজ করে তোলে, অন্যদিকে জনগণকে কীভাবে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল হতে বাধ্য করা যায় সেজন্য প্রশাসনিক ও সামরিক নজরদারি বৃদ্ধি করে চলে। অর্থাৎ কীভাবে যতটা বেশি সম্ভব কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি করা যায় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল বা উচ্চভূমিতে বসবাসকারী মানুষ কীভাবে এ জাতীয় রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়াকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এড়িয়ে যেতে পেরেছে তার একটা বিশ্লেষণ তৈরি করতে গিয়ে স্কট বলতে চান 'সভ্যতা পাহাড় বাইতে পারে না' (civilizations can't climb hills)। অর্থাৎ ভৌগোলিক দুর্গমতার কারণে রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের বিস্তার রুদ্ধ হয়। একই সূত্র ধরে বঙ্গীয় বদ্বীপের ক্ষেত্রে বলা যায় "সভ্যতা", সাম্রাজ্য প্লাবনভূমির পানিতে, জলাভূমির কাদায়ও আটকে যেতে পারে। আমরা অতীতের সাম্রাজ্যগুলো সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে ও সেগুলোর মানচিত্র দেখতে গিয়ে এ কথা প্রায়ই ভুলে যাই যে, সাম্রাজ্যগুলো সে সময় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা জনগোষ্ঠীর একটি সমষ্টি ছিল; সেখানে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব ছিল না দূরদূরান্তে গিয়ে নাগরিকদের জীবনে সরাসরি কেন্দ্রীয় নীতি চাপিয়ে দেওয়া কিংবা প্রত্যক্ষ নজরদারি চালানো। রাষ্ট্রের অবিরত নজরদারি ও খবরদারির মধ্যে থেকে আমরা এটাও ভুলে যাই যে, ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই, এমনকি কয়েকশ বছর আগেও সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের পরিসীমার বাইরে জীবনযাপন করে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল (Scott, 2009, p. 7)।

আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, বদ্বীপের আদি অধিবাসীরা কৃষিকাজ করত বটে, কিন্তু তাদের কৃষি কেবল এক প্রকারের ছিল না, কয়েক ধরনের কৃষিজ উৎপাদন প্রক্রিয়া সেখানে বিদ্যমান ছিল (Husain, 2022)। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় দেখান, ভূমি পরিমাপের জন্য যেসকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো সবই ছিল কৃষি সম্পর্কিত, আরও নির্দিষ্ট করে বললে শস্য-সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ বা আঢকবাপ, জমি পরিমাপের এই সবগুলো মানদণ্ডেরই ভিত্তি হলো বীজ বপন বা উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ (নীহাররঞ্জন, বা. ১৪২২, পৃ. ২০৫)। আবার এসকল পরিমাপ পদ্ধতি যে সব এলাকায় একইভাবে প্রয়োগ করা হতো তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই (রণবীর, ২০১৯, পৃ. ১১৩)। এ ধরনের হিসাব-নিকাশ জীবিকা অর্থনীতি ও ব্যক্তিমালিকানাবিহীন জমির দিকেই ইঙ্গিত করে। লোকসংখ্যার স্বল্পতা, উর্বর জমি ও জীবিকা অর্থনীতি বিদ্যমান থাকার কারণে ধরে নেওয়া যেতে পারে নিবিড় চাষের (intensive cultivation) চেয়ে বিস্তৃত চাষই (extensive cultivation) এই অঞ্চলে বেশি দেখা যেত।

নীহাররঞ্জন এটাও উল্লেখ করেছেন, খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমি পরিমাপের জন্য সবসময় এরূপ শস্য-সম্পর্কিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো না; কোনো কোনো জায়গায় 'নল-মানদণ্ডের' ব্যবহারের উল্লেখও আছে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে জমি মাপার বিষয়টা তখনই আসে যখন জমি হয়ে ওঠে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। জেমস স্কট তাঁর *Seeing Like a State* (1998) গ্রন্থে বলতে চান, জমি, ফসল বা অন্য যেকোনো কিছু পরিমাপের জন্য যেসকল অ-রাষ্ট্রীয় (non-state) পদ্ধতি দেখা যায়, সেগুলোর উৎপত্তি হয়েছে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের নিজস্ব যৌক্তিকতা থেকে এবং যা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ও রাজস্ব কাঠামোর জন্য নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করে (Scott, 1998, p. 32)। এরকম একটা ব্যবস্থায় একজন কৃষককে '২০ একর' জমির হিসাব বোঝানো, একজন পাঠককে ৫ কেজি বইয়ের কথা বলার মতোই অযৌক্তিক। এই বদ্বীপের শস্য-সম্পর্কিত পরিমাপ পদ্ধতির সাথে জমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সম্পর্ক নেই, বরং জমির উর্বরতার সাথে তা সম্পর্কিত। রাষ্ট্র প্রবর্তিত জমি পরিমাপ পদ্ধতি ও কর সংগ্রহের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার একরূপতা (uniformity) কর্মঘণ্টার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ জমির উর্বরতা বা শস্যের স্থানীয় চাহিদাকে তা একেবারেই আমলে নেয় না। তখন তুলনামূলক স্বল্প উর্বর জমিতে চাষ করে রাষ্ট্র/সাম্রাজ্যের করের চাহিদা পূরণ করতে গেলে জীবিকা অর্থনীতির ওপর গড়ে ওঠা সমাজগুলোতে কর্মঘণ্টা অনেক হারে বেড়ে যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হলো, আগেকার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগুলোতে প্রত্যক্ষ নজরদারির অভাবের কারণে কৃষি সমাজের ওপর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক কিংবা আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল অনেকাংশেই ঢিলেঢালা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতাকে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি ও যাজক গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করতে হতো নজরদারি চালানো কিংবা কর সংগ্রহের জন্য। কেবল এই স্থানীয় হর্তাকর্তাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল একেবারে ব্যক্তি বা গৃহস্থালি পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো। ফলে এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সাথে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের বোঝাপড়াটা হতো সমষ্টিভিত্তিক, ব্যক্তির সাথে কেন্দ্রের কোনো সম্পর্ক সেখানে স্থাপিত হতো না (Scott, 1998, p. 43)। দূরবর্তী কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপর খবরদারি করার প্রযুক্তি না থাকা, প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা কিংবা তথ্যের অভাব সবগুলোই এর জন্য দায়ী ছিল। আরও দায়ী ছিল স্থানীয় উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমের কাঠামো ও মূল্যবোধের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অজ্ঞতা। লোকজ জ্ঞান স্থানীয় প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের জীবনযাপন পদ্ধতি দেখা যাওয়াটা স্বাভাবিক যা তাদের কর্মঘণ্টার সাথেও সম্পর্কিত। ফলে সংগৃহীত কর, ফসল বা জমির পরিমাণ ইত্যাদিকে কেন্দ্রীয় পরিমাপ পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। বঙ্গীয় বদ্বীপের পূর্বাংশের ক্ষেত্রে মুঘল আমল পূর্ববর্তী জমিব্যবস্থা বিষয়ক তথ্য যা পাওয়া যায় তা খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ, তবে মুঘল আমল বা তার পরবর্তী জমিব্যবস্থা সম্পর্কিত বিস্তারিত লিখিত তথ্যাবলি খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত

বাংলার কৃষক (*The Peasantry of Bengal*) গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে নরহরি কবিরাজ মন্তব্য করেন, "আইন-ই-আকবরি অনুসারে মুঘল শাসনে সরকার ও রায়তের মধ্যে মধ্যবর্তী কোনো যোগাযোগ মাধ্যম ছিলো না"। তিনি আরও বলেন, "সম্রাট ছিলেন রাজস্বের মালিক তবে তিনি জমির মালিক ছিলেন না" (রমেশচন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ১)। হোসেনউদ্দীন হোসেন (২০১৬, পৃ. ১৫) মনে করেন, মধ্যযুগের বাংলায় শাসক শ্রেণির মধ্যে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস (hierarchy) তেমন একটা প্রকট ছিল না এবং ভূস্বামীরা প্রকৃতপক্ষে শাসকও ছিলেন না; তারা কেবল কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচার ও শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার রাখতেন। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট রাজধানী থেকে বহুদূরে অবস্থিত জায়গাগুলোর জমি পরিমাপের বা হিসাবের ঝামেলার মধ্যেই যেতে চাননি, বরং রায়তের 'নিরাপত্তা বিধানের' বিনিময়ে তিনি কেবল রাজস্ব আদায়ের ওপর জোর দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু বিধিনিষেধ থাকলেও কৃষিজীবী মানুষ বহুলাংশেই স্বাধীনভাবে তাদের জমি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল। কোম্পানি আমলে যা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে নরহরি কবিরাজ মন্তব্য করেন, "কলমের খোঁচায় বাংলার জমিদারেরা বংশগত মালিকে পরিণত হয়– যারা ছিলো রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র" (রমেশচন্দ্র, ২০০৮, পৃ. ২)। তদুপরি, জমির মালিকানার বিষয়টি ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলার প্রেক্ষাপটে সবসময়ই একটা ধোঁয়াশাপূর্ণ বিষয় ছিল। কারও কারও ধারণা ছিল এই অঞ্চলে ভূমির মালিক ছিল গ্রাম কমিউন (Guha, 1915, pp. 8–18)। পরবর্তীকালে অনেকে মনে করেছেন আসলে পরিবারগুলোর হাতেই জমির মালিকানা ন্যস্ত ছিল এবং বংশানুক্রমিকভাবে কে বা কারা মালিকানা লাভ করবে তা পরিবার প্রধান নির্ধারণ করে দিতেন (Mookerji, 1940, pp. 4–5)। ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত 'Calcutta Review'-র একটা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, যারা জমির চাষ করত তারাই জমির মালিক (Boutros, 1846, p. 309)। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেছেন প্রাচীনকালে ভূমির সহজলভ্যতার কারণে জমির মালিকানার প্রশ্নটাই অবান্তর। মৌর্যযুগে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পরই উত্তর ভারতের আর্যাবর্তের মালিকানা রীতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে; তবে তখনও রাজাকে জমির মালিক মনে করা হতো না, বরং রক্ষাকর্তা হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। আর গ্রামের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজা স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না, বরং গ্রামের সামষ্টিক স্বার্থের কথা বিবেচনায় রাখা হতো ও সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগও ছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির বাইরেও গ্রামীণ সমাজে পথ-ঘাট, গোবাট, গোচরের মতো এমন অনেক ধরনের জমি ছিল যেগুলো সামাজিক মালিকানাধীন (নীহাররঞ্জন, ২০১৫, পৃপৃ. ২৮২–২৮৫)। সতেরো শতকে ভারতবর্ষে আগত ইউরোপীয়রা যে চিত্র তুলে ধরে, সেখানে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রই ছিল জমির প্রকৃত মালিক (Bernier, 1934, pp. 211–212, 220–226)। আবার ব্রিটিশ প্রশাসক জন শোরের মতে রাজা মালিক ছিলেন না, বরং তার ভূমিকা ছিল অনেকটা পালনকর্তার মতো যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের ভাগ ছাড়া তার আর কোনো ধরনের অধিকার জমির ওপর ছিল না (Choudhury, 2024, p. 29)।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই পুরো ব্যবস্থাটা এমন একটা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি ইঙ্গিত করে যেখানে প্রতিবেশগত ও ভৌগোলিক কারণে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল, জমির মালিকানা সুস্পষ্ট নয় এবং যা তৈরি করেছিল এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, যাকে বলা যেতে পারে জীবিকা অর্থনীতি বা সাবসিস্টেন্স অর্থনীতি। এ ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মঘণ্টার স্বরূপ কী রকমের হতে পারে তা পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে।

বঙ্গীয় বদ্বীপের স্বল্প কর্মঘণ্টার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু অনুমান ও একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা

প্রাচীন বা মধ্যযুগে এই অঞ্চলের কৃষকদের কর্মঘণ্টা কীরকম ছিল তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা আর সম্ভব নয়। আমরা যা পারি তা হলো, তৎকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কিছু অনুমান করতে; আর কেনই-বা ঔপনিবেশিক প্রশাসক থেকে এদেশীয় ইতিহাসবিদেরা বারবার বদ্বীপের কৃষকদের আলস্য, কর্মবিমুখতা ও উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে কিছু বোঝাপড়া চালানোর চেষ্টা করতে। এ ধরনের চিন্তা বা মূল্যবোধের পেছনে রয়েছে ইউরোকেন্দ্রিক (Eurocentric) কিছু ধারণা যা বাজার-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং ঔপনিবেশিক যুগ থেকে যা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

পিয়ের ক্লাসত্রেস (Clastres, 1989, p. 193) মনে করেন, পশ্চিমা সভ্যতা ও তার আগ্রাসনের ভিত্তি ছিল মূলত দুটি বিষয় যেগুলোকে তারা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। একটি হলো, সমাজকে গড়ে উঠতে হয় রাষ্ট্রের ছায়াতলে যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ ও সমাজের মানুষের নিরাপত্তা বিধান করে। আরেকটি হলো, মানুষকে কাজ করতেই হবে। শ্রম বা কাজের পশ্চিমা সংজ্ঞায়ন ও শ্রমের বাধ্যবাধকতার ঐতিহাসিক, এথনোগ্রাফিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্লাসত্রেস দেখান, ঔপনিবেশিক যুগের শুরু থেকেই ইউরোপীয়রা যেখানে যেখানে গেছে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের তারা "ধর্মহীন", "রাজ্যহীন" ও "অলস" হিসেবে চিহ্নিত করতে একবারও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তারা বোঝার চেষ্টা করেনি যে, এসকল 'রাষ্ট্রবিহীন' ও জীবিকা-অর্থনীতির কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা সমাজে মানুষ ততটুকুই কাজ করে, যতটুকু তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য করা দরকার। বাজারভিত্তিক পুঁজি অর্থনীতির প্রতিযোগিতা ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাওয়াটাকে পশ্চিমারা দেখেছে সভ্যতা ও প্রগতির মানদণ্ড হিসেবে এবং সেই চিন্তা তারা অ-ইউরোপীয় সমাজের ওপরও জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে বারবার।

ক্লাসত্রেস উদাহরণ হিসেবে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি দেখান এসকল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও (কোনোটি ছিল শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ, কোনোটি উদ্যানপালক, কোনোটি কৃষীজীবী, কোনোটি-বা মিশ্র) এই সমাজগুলোতে জীবিকা-অর্থনীতি বিদ্যমান ছিল এবং তারা কেউই

'কাজের' জন্য খুব বেশি সময় ব্যয় করত না। উদাহরণস্বরূপ টুপি-গোয়ারানি (Tupi–Guarani) ভাষাগোষ্ঠীর কৃষিজীবী মানুষদের আলস্য সে সময়কার পর্তুগিজ ও ফরাসি ঔপনিবেশিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। ফরাসি নৃবিজ্ঞানী জাক লিজো ভেনেজুয়েলার আমাজন অঞ্চলের অধিবাসী ইয়ানোমামি (Yanomami) জনগোষ্ঠীর সাথে প্রায় ২০ বছর কাটান। ক্লাসত্রেস লিজোর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেন যে, এই জনগোষ্ঠীর মানুষ দিনে তিন ঘণ্টার বেশি কাজ করত না। ক্লাসত্রেস নিজে কাজ করেছিলেন প্যারাগুয়ের বনাঞ্চলে বসবাসকারী গোয়েইয়াকি (Guayaki) জনগোষ্ঠীর ওপর এবং তিনি নিশ্চিত করতে চান যে, এই মানুষেরাও দিনের অর্ধেকের বেশি সময় কোনো ধরনের কাজ করত না। পরিশেষে তিনি বলতে চান, পৃথিবীর যেকোনো স্থানেই যদি জীবিকা-অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের কর্মঘণ্টার ওপর গবেষণা চালানো হয়, তাহলেও অনুরূপ স্বল্প কর্মঘণ্টাই দেখা যাবে; সেখানকার প্রতিবেশগত অবস্থা যা-ই হোক না কেন।

আমেরিকা মহাদেশের জনগোষ্ঠীর সাথে বঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষকদের তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চিতভাবেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রতিবেশগত জায়গায় দুটি স্থানের পার্থক্য অসংখ্য। আমাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রহীন বা ঢিলেঢালাভাবে গঠিত হওয়া রাষ্ট্র/সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা, জীবিকা-অর্থনীতি অবলম্বন করে বেঁচে থাকা মানুষের কর্ম-মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় বদ্বীপের অবস্থার পর্যালোচনা করা। জীবিকা-অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত মানুষের শ্রম, চাহিদার ধরন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলো তাদের কর্মঘণ্টা সীমিত রাখতে সহায়তা করে। মার্শাল সাহলিন্স তাঁর ১৯৬৬ সালের প্রবন্ধ 'The Original Affluent Society'-তে দেখানোর চেষ্টা করেন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজগুলোই আসলে প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ এবং সেখানে অল্প সময় কাজ করেই মানুষ তাদের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে পূরণ করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালের গবেষণায় অবশ্য উঠে আসে এই সমাজগুলোতে রোগ, শিশুমৃত্যুর হার, সংঘাত ইত্যাদি অনেক বেশি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং সেই সমাজগুলোকে সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ বলাটা যথার্থ নয়। কিন্তু এটা মোটামুটি সত্য যে, কর্মঘণ্টার দিক থেকে হিসেব করলে জীবিকা-অর্থনীতির অধীনে থাকা মানুষ বাজারব্যবস্থার অধীনে থাকা মানুষের চেয়ে 'অর্থনৈতিক' কাজ কম করে থাকে। এখন নৃবৈজ্ঞানিক বা এথনোগ্রাফিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনীতির আলোচনা করতে গেলে পুঁজি, বাজার ও প্রতিযোগিতার বাইরে 'অর্থনৈতিক' কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়া কীরূপ হতে পারে সেই বোঝাপড়া চালানোটা সহজ হয়ে যায়।

গিউডম্যান (Gudeman, 2001) মনে করেন অর্থনীতির দুটি ক্ষেত্র রয়েছে– একটি হলো সমষ্টি (community) বা সমাজ এবং অপরটি হলো বাজার তথা ব্যক্তিগত সম্পর্কহীন (impersonal) বাণিজ্য। এই দুটি ক্ষেত্রের গঠন, কাঠামো, নীতি ও প্রণালির মধ্যে বিস্তর

পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুটি ক্ষেত্র একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, দুটিই একীভূত হয়ে ঐক্যবদ্ধ একটি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাজ করে। ক্লাসত্রেস (1989, p. 199) ব্যাপারটাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং দাবি করেন রাষ্ট্রবিহীন প্রাচীন সমাজ বা সমষ্টিগুলোতে কোনো অর্থনীতিই নেই, কারণ তারা অর্থনীতিকে নাকচ করে দেয়। এ ধরনের সমাজগুলোতে অর্থনীতি আলাদা কোনো সত্তা হিসেবে বিরাজ করতে পারে না, কারণ অর্থনীতি সেখানে স্বাধীন নয়, তা জীবন-জীবিকার যাবতীয় সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ও ক্রিয়াশীলতার জায়গায় সমাজ, সংস্কৃতির অন্য সকল ক্ষেত্রের সাথে একীভূত। তিনি আরও মন্তব্য করেন, এই সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্যই হলো কাজকে যতটা সম্ভব অস্বীকার করা। তাঁর মতে মানুষ তখনই তার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের চেয়ে বেশি কাজ করে, যখন সে তা করতে বাধ্য হয় এবং বাধ্যবাধকতার ঠিক এই বিষয়টাই জীবিকা-অর্থনীতিতে অনুপস্থিত। এর মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে এমন কিছু মূল্যবোধ তাড়িত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া যা বলপ্রয়োগকারী কাঠামোর উদ্ভব রোধ করে এবং একটি সাম্যবাদী অবস্থা সৃষ্টি করে; আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে অসাম্য বা বৈষম্যকে প্রতিহত করে (Clastres, 1989, p. 199)। এ জাতীয় সাম্যবাদী চেতনার (egalitarian ethos) ব্যাপারে বোয়েম (Boehm, 1993) বলতে চেয়েছেন যে, তা তৈরি হয় এমন একটা সংস্কৃতি থেকে যা কর্তৃত্ববাদ বিরোধী। যে সংস্কৃতিতে মানুষ মনে করে অন্য আরেকটা মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার বিষয়টাই অনৈতিক।

পুঁজিবাদী চেতনা সবকিছুকে একটি পণ্য বানিয়ে ফেলতে চায় এবং মানুষের সময়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতির উদ্দেশ্যই হলো ন্যূনতম মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব সময় আদায় করে নেওয়া; এখানে কর্মঘণ্টা পুঁজিপতির জন্য একটা উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি কিছু না। মার্ক ফিশার (Fisher, 2009) বর্ণিত পুঁজিবাদী বাস্তবতা (capitalist realism) আমাদের মধ্যে এখন এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, আমাদের পক্ষে অনেক সময় জীবিকা-অর্থনীতি ও তার সাথে সম্পর্কিত সীমিত কর্মঘণ্টার কথা ভাবাই কঠিন হয়ে যায়। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত কাজকে আমরা এতটাই পবিত্র জ্ঞান করি যে আমাদের কাছে মনে হয় প্রতিনিয়ত কাজ না-করা মানুষ অকর্মণ্য ও উদাসীন; এমনকি সমাজ ও পরিবারের জন্যও সে কলঙ্কজনক। পুঁজিবাদ-পূর্ব জীবিকা-অর্থনীতির সমাজে বিষয়টা এরকম ছিল না। যেখানে সময় কোনো পণ্য নয়, মুনাফা বৃদ্ধি যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, সেখানে কর্মঘণ্টার সাথে মানুষের বোঝাপড়া মৌলিকভাবেই আলাদা। পুঁজিবাদ-পূর্ব সমাজের কৃষিজীবীদের উদাহরণ টেনে ডেভিড ফ্রেইন (Frayne, 2015, p. 28) বলতে চান, সেই সময়ে কোনো কৃষককে যদি অধিক মজুরির সুযোগ দেওয়া হতো, তখন সে কীভাবে অধিক অর্থ সঞ্চয় করা যায় সেটা না ভেবে হিসাব করার চেষ্টা করত কীভাবে তার অবসরের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ফ্রেইনের মতে, সেই সময়কার কৃষক কাজের জন্য বাঁচত না, বরং বাঁচার জন্য কাজ করত। ক্লাসত্রেসও (1989, p. 196) অনুরূপ একটা উদাহরণ টেনে

বলতে চান, একজন আদিবাসী আমেরিকানকে যদি তার ব্যবহৃত পাথরের কুঠারের বদলে একটি উন্নতমানের লোহার কুঠার এনে দেওয়া হতো যেটা দিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে একই কাজ করা যায়, তাহলে সে দশগুণ মুনাফার কথা না ভেবে কীভাবে দশগুণ বেশি অবসর উপভোগ করা যায় সে কথাই ভাবতো।

আমরা শুরুতেই দেখেছি বঙ্গীয় বদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রতিবেশ ও দুর্গমতার কারণে এর এক প্রকারের প্রান্তিকীকরণ ঘটেছিল। যে প্রান্তিকীকরণ একদিকে যেমন আর্থ-রাজনৈতিক অন্যদিকে সাংস্কৃতিক। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এই বদ্বীপকে ইউরোপীয় সংজ্ঞার্থের ভিত্তিতে "সভ্য" প্রমাণ করতে এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁদের চিন্তা এত বেশি ইউরোকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, এই অঞ্চলকে ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাজন (hierarchy) ও প্রশাসন সম্পন্ন একটি সুগঠিত 'রাজ্য' বা 'দেশ' হিসেবে উপস্থাপন করতে পারলে অ্যাকাডেমিক ইতিহাসের পাতায় বদ্বীপটির প্রান্তিক অবস্থান খানিকটা লাঘব করা সম্ভব হবে। তাঁদের জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও কঠোর পরিশ্রমকে মহান মনে করার মতো কিছু পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা এই অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে তাঁরা এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা প্রকৃত আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না। প্রতিবেশের সাথে সামাজিক কার্যকলাপের সম্পর্ক নির্মাণের চেষ্টা সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। বাজারব্যবস্থা, মুনাফা প্রীতি, প্রতিযোগিতার মতো যাবতীয় পুঁজিবাদী বিষয় ধীরে ধীরে এই অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলার আগে বিদ্যমান জীবিকা-অর্থনীতি আমাদের সামনে ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। সেই সমাজে মানুষ নিজের কর্মকাণ্ড নিজে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করত, তাদের উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন ও বিনিময়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিজেরা নিত এবং সর্বোপরি তারা কাজ করত নিজের ও নিজের সমাজের চাহিদার কথা ভেবে। তাদের কর্মঘণ্টা ছিল ততটুকুই যতটুকু তাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক।

ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী আগ্রাসন ও কর্মঘণ্টার পরিবর্তন

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত যেসকল বিবরণ ও তথ্য-উপাত্ত দেখেছি তার সবই ঔপনিবেশিক আমলে সংগৃহীত। ইংরেজদের মুনাফা তাড়িত আধুনিক প্রযুক্তি, শিল্পায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সূক্ষ্ম প্রশাসনিক কাঠামোর সম্মিলিত প্রয়াসে এককালের দুর্গম ও কেন্দ্রীয় নজরদারির বাইরে থাকা অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীগুলো ধীরে ধীরে বৃহত্তর কাঠামোর অংশ হয়ে পড়তে থাকে। বাজার অর্থনীতির আগ্রাসন জীবিকা-অর্থনীতির স্থানীয় কাঠামোগুলো ভেঙে ফেলতে থাকে এবং মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক নকশার কাঁচামাল যোগানের মাধ্যম হিসেবে সেগুলোকে বলপ্রয়োগ দ্বারা ঢেলে সাজানোর জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে একদিকে যেমন নতুন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর উৎপত্তি ঘটে অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সূচিত হয়। ইউরোপীয় আধুনিকতার অর্থনৈতিক রূপ হলো শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। তবে বাংলার বদ্বীপে, বিশেষত এর

পূর্বদিকে সে ধরনের কিছুই হয়নি। বাংলা ও সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল ইংরেজদের নিজস্ব শিল্পে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করার একটা উপায় মাত্র; অর্থাৎ এই অঞ্চল শিল্পায়িত হলে তা ইংরেজদের জন্যই সমস্যা তৈরি করত। তাই তারা এই অঞ্চলকে ব্যবহার করতে চেয়েছে পাট, চা, তুলা তামাকের মতো অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে যা তাদের দেশের মানুষের ভোগবাদী সংস্কৃতির জন্য সহায়ক হবে এবং তাদের শিল্পগুলোর উৎপাদন খরচ কমাবে (সুকোমল, ২০১৫)।

হয়ত বহুকাল আগে থেকে বাংলার কৃষিজমি ও কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা বিভিন্ন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনগুলো করেছে। তবে মোঘল যুগ থেকেই বাংলার কৃষিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের নির্ভরযোগ্য লিখিত খতিয়ান পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের আমলে বাংলার ১,১২,৭৮৮টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৫৩৮টি গ্রামের মাপ নির্ধারণ করা হয়েছিল। *আইন-ই-আকবরি* থেকে কৃষিজমি ও কৃষিজীবী মানুষের বসতি সম্পর্কে যা জানা যায় তাও খুব একটা বিশদ নয়। তদুপরি রাজধানী থেকে যত পূর্ব দিকে তথা যত বেশি বদ্বীপের দিকে অগ্রসর হতে হয় ও পূর্ববাংলার কথা আসতে থাকে, তথ্য-উপাত্ত ও হিসাব ততই ঘোলাটে হতে থাকে (অনিল, ২০১৯, পৃ. ৩০–৩৬)। এর কারণ স্বভাবতই এই অঞ্চলের ঘন বনাঞ্চল, বর্ষাকালের বন্যা, বিস্তীর্ণ ও পরিবর্তনশীল নদী-ব্যবস্থা, জলাভূমি, অসংখ্য দ্বীপ ও চরাঞ্চল, যা মধ্যযুগের যেকোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জন্যই পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য, এমনকি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তবে সতেরো শতকে এসে বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ ও প্রশাসনিক নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি, ব্যাপক হারে কৃষিজমির সম্প্রসারণ ঘটছে ও জনবসতি গড়ে উঠছে। তবে তখনও সমস্ত ভূমি নজরদারির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি (পূর্বোক্ত, পৃপৃ. ৪১–৪৪)। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন শুধু কর সংগ্রহের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী ছিল এবং তারা তা করে থাকতো স্থানীয় প্রশাসন ও অভিজাতদের মাধ্যমে।

ইংরেজরা আঠারো শতকে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিতে শুরু করলে প্রথমেই জমির পরিমাপ ও মালিকানাকেন্দ্রিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সাথে এই অঞ্চলের সামাজিক বা মিশ্র মালিকানার ধারণা একদিকে যেমন খাপ খাচ্ছিল না, অন্যদিকে কর আরোপ ও সংগ্রহের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল জমি পরিমাপ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর একরূপতা বা ইউনিফর্মিটি নিশ্চিত করা। তাদের এই মুদ্রা-অর্থনীতিকেন্দ্রিক নীতির ফলে জীবিকা অর্থনীতির প্রথাগত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত শস্যকেন্দ্রিক জমির হিসাব এলোমেলো হয়ে যায়। আঠারো শতকে কর্নওয়ালিসের হিসাব মতে বাংলার ৩৩% জমিতে চাষাবাদ হতো, তবে পতিত জমি ও চারণভূমি এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (সুবোধ, ২০১৭, পৃ. ৬৯)। ইংরেজরা পূর্ণবিকশিত পুঁজিবাদী ধারণা নিয়েই এদেশে উপনিবেশায়ন শুরু করে এবং তাদের লক্ষ্যই ছিল জমিকে যতটা সম্ভব উৎপাদনশীল করে তোলা; অর্থাৎ জমি থেকে

সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা আদায় করা। সুবোধ কুমার (পুর্বোক্ত, পৃ. ৭১) আরও মন্তব্য করেন, আঠারো শতকে উপনিবেশায়নের শুরুর দিকে কৃষির তেমন গুরুতর কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং সে সময়কার কৃষিজীবীদের মধ্যে নিবিড় চাষের চেয়ে বিস্তৃত চাষের প্রবণতাই বেশি দেখা যেত। একই সাথে বছরে জমি একাধিক চাষের (crop rotation) কোনো প্রবণতাও দেখা যেত না; অর্থাৎ অল্প জমিতে কীভাবে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে কৃষক ততটা চিন্তিত ছিল না। মোঘল যুগের সমাপ্তি ও উপনিবেশায়নের প্রাথমিক কালের পরিস্থিতি বঙ্গীয় বদ্বীপে একটি জীবিকা অর্থনীতির প্রতিই ইঙ্গিত করে, যেখানে কৃষকেরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে আগ্রহী নয়।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিদারদের জমির মালিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে স্থাপন ও করারোপ ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনের পথ সুগম করে দেয় এবং প্রথাগত জীবিকা-অর্থনীতি ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে। প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার কৃষিজ পণ্য ইউরোপে রপ্তানি না হলেও আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে ঘটতে থাকা শিল্পবিপ্লবের কারণে সেখানে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাংলার উর্বর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পাওয়া শুরু করে। এর ফলে একসময়ের স্থানীয় জীবিকা-অর্থনীতিভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি বিশ্ব বাজারব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হয় এবং মুদ্রাব্যবস্থার আগ্রাসনের ফলে কৃষিজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাণিজ্যিকীকরণ আরম্ভ হয় (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২–৭৩)। পুঁজি ও মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের ধারণা কৃষিতে প্রবেশ করার ফলে জমি ও শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের বোঝাপড়া মূলগত জায়গায় পালটে যায়। জীবিকা-অর্থনীতির জায়গা দখল করে নেয় বাজার অর্থনীতি। জমির মালিক তার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য জমি থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদনের কথাই ভাবতে থাকে। পুঁজির বৈশিষ্ট্যগত নিয়মে বিস্তৃত চাষের জায়গায় দেখা দিতে থাকে নিবিড় চাষ, যা পক্ষান্তরে কৃষিজীবী মানুষদের কর্মঘণ্টাই বাড়িয়ে তোলে। আঠারো শতকের শেষদিকে বাংলায় ব্যাপক হারে পাট, তামাক, তুলা, রেশমের মতো অর্থকরী ফসলের চাষ ব্যাপক হারে শুরু হয়। যার ফলে দেখা দেয় বছরব্যাপী কৃষিকাজের উদ্ভব যা পূর্বে অনুপস্থিত ছিল (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭–৭৮)।

আঠারো শতকের শেষদিকে খাজনার হার বৃদ্ধি পেতে থাকার কারণে কৃষককে শুধু চাষাবাদের ওপর নির্ভর করলে চলতো না। জীবন ধারণের তাগিদেই তাকে অন্যান্য কাজে সংযুক্ত হতে হতো। কিছু কৃষক, যাদের গবাদিপশু এবং সহজলভ্য চারণভূমি ছিল, তারা দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করা শুরু করে। অন্যদিকে অনেকেই নতুন তৈরি হওয়া কৃষিজমিগুলোতে অর্থকরী ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িয়ে পড়ে (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭)। এই সময়ে কর্মঘণ্টার ধরন নির্ভর করত কৃষকের বস্তুগত অবস্থার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই ধনী কৃষকের

কর্মঘণ্টা একজন ভূমিহীন কৃষকের কর্মঘণ্টার থেকে অনেক আলাদা ছিল। ১৮৮৮ সালে বাখরগঞ্জের কালেক্টর এইচ স্যাভেজের পক্ষ থেকে ঢাকার কমিশনার ডব্লিউ. আর. লারমিনিকে পাঠানো একটি চিঠি থেকে জানা যায়, এই জেলার কৃষকেরা তাদের সঙ্গতিসম্পন্ন অবস্থার কারণে চাষাবাদের সাথে যুক্ত থাকে না, বাইরে থেকে মজুর এনে কাজ করায় এবং নিজেরা “আলসেমি করে সময় কাটায়” (মুনতাসীর ও মাহবুবর, ২০১২, পৃ. ২৩১)। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তৈরি হওয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে (Bose, 1993, pp. 22–23)। চাষযোগ্য নতুন জমির উদ্ভবের সাথে যুক্ত হয় জমিদারদের মুনাফাপ্রীতি এবং সেখান থেকে সর্বোচ্চ লাভ আদায় করে নিতে চাওয়ার প্রবণতা থেকে শ্রমের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে যেমন দেখা দেয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Choudhury, 2024, pp. 45–46), অন্যদিকে জমিদারদের লোভের খেসারত দিতে হয় কৃষি শ্রমিকদের। ফলে বৃদ্ধি পায় কর্মঘণ্টা। নতুন কৃষিকাজের আওতায় আনা জমিগুলোর বণ্টনও নিশ্চিতভাবে সাম্যের কথা মাথায় রেখে হয়নি। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার কর্মঘণ্টার কোনো সমন্বিত বা একত্রকৃত বিবরণ তৈরি করা সম্ভব নয়। কৃষক ও কৃষিজীবী শ্রমিকদের বৈচিত্র্যময় আর্থসামাজিক অবস্থা সুনিশ্চিতভাবেই তাদের কর্মঘণ্টার ওপর প্রভাব রেখেছিল এবং যার কারণে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কর্মঘণ্টা দেখা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পুঁজিবাদী আগ্রাসনের আলোচনায় আরও যে বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে, তা হলো মজুরি শ্রম। পুঁজিবাদের অন্যতম ভিত্তি হলো জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে পুঁজিপতিদের অধীনস্থ করে ফেলা এবং তা হাসিল করার কার্যকর পন্থা হলো মজুরি শ্রমকে যতটা সম্ভব সর্বব্যাপী করে তোলা। পুঁজির গঠন ও বিকাশের জন্য মজুরি শ্রম সবসময়ই জীবিকা-অর্থনীতির চাহিদাভিত্তিক শ্রমের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত। এই মজুরি শ্রমকে সর্বজনীন করে তোলার উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা শুরু করে। এর ফলে দেখা যায় যে, “একজন ভাগচাষী উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পেয়েও একজন কৃষি মজুরের চেয়ে কম রোজগার করতো” (সুবোধ, ২০১৭, পৃ. ৭৭)। তবে অল্প কিছুকালের ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শাসন দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্য ও কর্ম- মূল্যবোধকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়নি। আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে বিভিন্ন অর্থকরী ফসল চাষের মাধ্যমে পুঁজিবাদী কৃষিকাজ প্রচলনের ও কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাজারকেন্দ্রিক করে তোলার সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টা জারি থাকলেও শ্রম-কাঠামো তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। উনিশ শতকের শুরুর দিকেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি মজুরি শ্রমিক দেখা যেত না, যা সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য জায়গার চেয়ে ভিন্ন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে (Van Schendel, 2006, p. 240)। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর স্বাধীন, পরিবারভিত্তিক কৃষিজ উৎপাদন কাঠামো ধীরে

ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে এবং বাংলার অধিকাংশ স্বল্প আয়ের মানুষই মজুরি শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণের কারণে বঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষি-কাঠামোতে যে ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সমাজ, অর্থনীতি ও মানুষের শ্রম-মূল্যবোধে। এই কৃষিজীবীদের কর্মঘণ্টা হয়তো যথেষ্ট কম ছিল, কিন্তু তা এক প্রকারের সমস্যাও হয়ে উঠেছিল। কৃষিকে ঘিরে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা এই সমাজে কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যেমন সম্ভব হতো না, কারণ সেরকম কোনো কাজের কথাই তাদের জানা থাকার কথা নয়। ফলে এককালের বিনিময়, পারস্পরিকতা ও সমবায়ের কাঠামো ত্যাগ করে সদ্য মুদ্রায়িত (monetised) হওয়া একটি সমাজে কাজের অভাব অনাহারে থাকার সমার্থক হয়ে উঠতে বাধ্য। এই বদ্বীপের কর্মঘণ্টা কম ছিল কারণ মানুষ এখানে প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন করত, বাজারজাত করা বা মুনাফা লাভের জন্য নয়। একটা জীবিকা-অর্থনীতি বজায় রাখা কিংবা ক্রমাগত পুনরুৎপাদন করে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর সাম্রাজ্য/রাষ্ট্রের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে এই অঞ্চলের প্রত্যক্ষ সংযুক্তি ঘটার ফলে এবং একই সাথে নতুন ধরনের সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো ও মূল্যবোধ জেঁকে বসার কারণে প্রথাগত সমাজ ভেঙে পড়তে থাকে। এরকম একটা অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসকেরা তৈরি করেছিল কৃষকদের অর্থকরী ফসল চাষে বাধ্য করতে, জমি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল ও কর আদায় করতে, কিংবা স্থানীয় শিল্পগুলোতে শ্রমিকের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। মোদ্দাকথা হলো, প্রতিবেশগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধগত নানা উপাদানের সম্মিলিত পরিবর্তন সাধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বদ্বীপের সমাজ একটি জীবিকা-অর্থনীতি থেকে মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতিতে অবস্থান্তর ঘটার কারণে কৃষিজীবী মানুষের কর্মঘণ্টার পরিবর্তন ঘটেছিল।

উপসংহার

মানুষ ততটুকুই কাজ করে যতটুকু তার প্রয়োজন এবং বাধ্য না হলে সে তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাজ করে না– আমরা যদি জীবিকা-অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে ক্লাসত্রেসের এই বক্তব্য সঠিক ধরে নিই (এথনোগ্রাফিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের এই কথাটিই বলে), তাহলে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে এককালের বঙ্গীয় বদ্বীপের কৃষি-শ্রমের ধরন বর্তমান দৃশ্যমান অবস্থা থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। বিদ্যমান পুঁজিকেন্দ্রিক, ভোগবাদী, কাজ-পাগল সমাজে 'অকর্মণ্যতাকে' ও কর্মবিমুখ ব্যক্তির ওপর এতটাই কালিমা লেপন করা হয় এবং অবিরাম কঠোর পরিশ্রমকে এতটাই মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করা হয় যে, এর বাইরে অন্য ধরনের কর্মমূল্যবোধ বা work ethic-এর কথা চিন্তা করাটাই আমাদের জন্য কঠিন। পশ্চিমা সমাজে 'কাজ' এতটাই কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে নিয়েছে এবং সেটাকে তারা সভ্যতা, উন্নয়ন ও প্রগতির ধারণাগুলোর

সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করে ফেলেছে যে, তারা অ-ইউরোপীয় সমাজের 'কাজ না করা মানুষদের' দেখে তাদেরকে অকর্মণ্য, অলস, কর্মবিমুখ থেকে সরাসরি অসভ্য বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিতীয়বার ভাবেনি। কাজ সংক্রান্ত পশ্চিমা সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এদেশীয় ইতিহাসবিদেরাও বহন করেছেন এবং পশ্চিমাদের সুরেই তারা কথা বলে গেছেন। ম্যাক্স ওয়েবারের বিখ্যাত বই *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী সমাজের সার্বিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার সাথে কাজের নৈতিকতা কীভাবে সম্পর্কিত হয়ে গিয়েছে তা তুলে ধরা। বর্তমানের ভোগবাদী সংস্কৃতিতে তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক কারণ অতিরিক্ত কাজ করলেই মানুষের পক্ষে সম্ভব অতিরিক্ত আয় করা ও পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত ব্যয় করে 'অর্থনীতিকে সচল রাখা'। এর ফলে একদিকে যেমন আমরা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার চাপে পিষ্ট হয়েও সেটাকে স্বাভাবিক ও 'প্রাকৃতিক' একটা বিষয় হিসেবে মেনে নিচ্ছি, ক্রমবর্ধমান কাজের চাপকে প্রগতির সমার্থক বলে স্বীকার করে নিচ্ছি, অন্যদিকে এর ফলে দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নানা বিপর্যয় (Stronge & Lewis, 2021)। এরকম একটা অবস্থায় অতীতের জীবিকা-অর্থনীতির মধ্যে জীবনযাপন করে যাওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকানো আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। কারণ বর্তমান সমাজের কাজের চাপের এই কাঠামোগত সহিংসতা আমরাই তৈরি করেছি ও আমরাই সেটিকে জিইয়ে রাখছি কোনো ধরনের প্রশ্ন না করে। এমতাবস্থায়, যেখানে আমরা ভুলতে বসেছি যে এরকম একটা ব্যবস্থার বিকল্প একটা সময়ে ছিল; অর্থনৈতিক ও শ্রম কাঠামোকে নতুন করে ভাববার সুযোগ আমাদের রয়েছে। হয়তো বঙ্গীয় বদ্বীপের আদি কৃষিজীবী মানুষের মূল্যবোধ ও সামাজিক জীবনের বিবিধ দিক আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক নতুন কিছু ধারণার সন্ধান দিতেও সক্ষম।

সহায়কপঞ্জি

অতুল সুর। (২০০৮)। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*। সাহিত্যলোক, কলকাতা।

অনিল কুমার দাস। (২০১৯)। *মোগল বাংলার অর্থনীতি*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

মমিন চৌধুরী, আবদুল; আকসাদুল আলম। (২০১৯)। 'ইতিহাস আগ্রয়ী ভূগোল'। *বাংলাদেশের ইতিহাস: আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা* প্রথম খণ্ড [সম্পা. আবদুল মমিন চৌধুরী], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ১–৩০।

নীহাররঞ্জন রায়। (বা. ১৪২২)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী। (২০১৫)। *বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র*। দে বুক স্টোর, কলকাতা।

মুনতাসীর মামুন; মাহবুবর রহমান [সম্পা.] (২০১২)। *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে গরীবদের জীবন*। অনন্যা, ঢাকা।

রণবীর চক্রবর্তী। (২০১৯)। 'অর্থনৈতিক জীবন: কৃষিকর্ম ও কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ'। *বাংলাদেশের ইতিহাস: আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা* দ্বিতীয় খণ্ড [সম্পা. আবদুল মমিন চৌধুরী], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ৯৩–১৭৮।

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনু. কাজী ফারহানা আক্তার লিসা, সাদাত উল্লাহ খান)। (২০০৮)। *বাংলার কৃষক*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুকোমল সেন। (২০১৫)। *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস: ১৮৩০–২০১০*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। (২০১৭)। *বাংলার আর্থিক ইতিহাস: অষ্টাদশ শতাব্দী*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

হোসেনউদ্দীন হোসেন। (২০১৬)। *বাংলার বিদ্রোহ: প্রথম খণ্ড (৬০০-১৯৪৭)*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

Boehm, C. (1993). Egalitarian Behavior and Reverse Dominance Hierarchy [and Comments and Reply]. *Current Anthropology*, 34(3), 227–254.

Bose, S. (1993). *Peasant labour and colonial capital: rural Bengal since 1770*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Boutros, F. (1846). `Principles of Public Revenue, with a short abstract of the revenue Laws in the Bengal Presidency'. In *The Calcutta Review* Vol. 6, Calcutta.

Clastres, P. (1989). *Society Against the State: Essays in Political Anthropology*. New York: Zone Books.

Choudhury, Nurul H. (2024). *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*. Dhaka: Kathaprokash.

Eaton, R. M. (1993). *The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204–1760*. Berkeley: University of California Press.

Fisher, M. (2009). *Capitalist Realism: Is There No Alternative?*. United Kingdom: Zero Books.

Frayne, D. (2015). *The Refusal of Work: The Theory and Practice of Resistance to Work*. India: Zed Books.

Gudeman, S. (2005). `Community and economy: economy's base'. In James G. Carrier (Ed.) *A Handbook of Economic Anthropology* (pp. 94–106). UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Guha, A.C. (1915). *A Brief Sketch of the Land Systems of Bengal and Behar*. Calcutta: Thacker, Spink and company.

Husain, S. (2022). `Society and Culture'. In A.F. Salahuddin Ahmed et al. (Ed.) *Bangladesh National Culture and Heritage* (pp. 121–143). Dhaka: The University Press Limited.

Iqbal, I. (2010). *The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840–1943*. United Kingdom: Palgrave Macmillan UK.

Madsen, T. (2018). *The Conception of Laziness and the Characterization of Others as Lazy*. Human Arenas, 1(3), 288–304.

Mookerji, R.K. (1940). *Indian Land System: Ancient, Medieval and Modern(with special reference to Bengal)*. Alipore: Bengal Government Press.

Redfield, R. (1956). *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. United States: University of Chicago Press.

Schendel, W. v. (2006). `Stretching Labour Historiography: Pointers from South Asia'. International review of Social History, 51, 229-261.

Schendel, W. v. (2009). *A History of Bangladesh*. (n.p.): Cambridge University Press.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven and London: Yale University Press.

Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. The Anarchist Library (www.theanarchistlibrary.org).

Scott, J. C. (2009). *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Ukraine: Yale University Press.

Shamsuzzoha, A.T.M (2022). `The Portrayal of Agriculture and Farmers in the Medieval Bengali Literature'. In *The Arts Faculty Journal: Centennial Issue* (pp. 73–96). University of Dhaka.

Stronge, W., Lewis, K. (2021). *Overtime: Why We Need A Shorter Working Week*. United Kingdom: Verso Books.

Weber, M. (2010). *Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Woodcock, G. (2016). The Tyranny of the Clock. In Freedom Press (Ed.), Why Work? Arguments for the Leisure Society (pp. 31–34). Oakland: Freedom Press.